# সূরা আল-ফাতিহা-এর তাফসীর

[ Bengali – বাংলা – بنغالي ]

শাইখুল ইসলাম মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল ওয়াহহাব রহ.

৯০৩

অনুবাদ: মুহাম্মাদ রকীবুদ্দীন হুসাইন

সম্পাদনা: ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

# تفسير سورة الفاتحة

شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب

ترجمة: محمد رقيب الدين أحمد حسين

مراجعة: د/ أبو بكر محمد زكريا

# সূচীপত্র

# অনুবাদকের কথা

আল্লাহ তা'আলার কালাম কুরআন মাজীদের প্রথম ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এক অংশ হলো এ সূরা আল-ফাতিহা। এ সূরা সমগ্র কুরআন মাজীদের সার-সংক্ষেপ। পূর্ণাঙ্গ সূরা রূপে এটিই প্রথম নাযিল হয় এবং কুরআন মাজীদের প্রথমেই এর স্থান নির্ধারণ করা হয়। এজন্য এর নাম সূরা আল-ফাতিহা (প্রারম্ভিক সূরা) রাখা হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: (যার হাতে আমার জীবন-মরণ, আমি তাঁর শপথ করে বলছি, সূরা আল-ফাতিহা-এর দৃষ্টান্ত তাওরাত, যাবুর, ইঞ্জিল প্রভৃতি কোনো আসমানী কিতাবে তো নেই, এমনকি পবিত্র কুরআনেও এর দ্বিতীয় নেই)। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন: (সূরা আল-ফাতিহা সব রোগের ঔষধ বিশেষ।) অপর আরেকটি হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: "যে ব্যক্তি সূরা আল-ফাতিহা পড়ে না তার সালাত হয় না।"[1]

সূরা আল-ফাতিহা মূলত একটি প্রার্থনা বিশেষ, যা আল্লাহ তা'আলা মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন। অবশিষ্ট কুরআন হলো তাঁর পক্ষ থেকে এর জবাব, যার মধ্যে মানবকুলের জন্য সহজ-সরল ও সঠিক জীবন-পথের পুর্ণাঙ্গ ও বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে।

শাইখুল ইসলাম মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল ওয়াহহাব রহ. কর্তৃক রচিত সূরা আল-ফাতিহা-এর এ তাফসীরখানা অতি সংক্ষিপ্ত হলেও তিনি এর মধ্যে আল্লাহর সাথে বান্দার মোনাজাত ও ইবাদাতে তাওহীদ -এ দু'টি বিষয় অত্যন্ত চমৎকার ও যুক্তিপূর্ণভাবে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন। পরবর্তীকালে রচিত তাফসীরগুলোতে সাধারণত: বিষয় দুটো এমন গুরুত্বসহকারে বর্ণনা করা হয় নি। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও বাংলা ভাষী ভাই-

---

[1] সহীহ বুখারী ও মুসলিম।

বোনদের প্রতি দায়িত্ব পালনের তাগিদে বাংলা ভাষায় সূরা আল-ফাতিহা-এর এ তাফসীরখানা অনুবাদ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি। যারা আরবী ভাষায় অজ্ঞ বা অদক্ষ তারা যাতে কমপক্ষে ১৭ বার দৈনিক সালাতে পঠিতব্য এ সূরাটি স্থিরচিত্তে পড়েন এবং কী বিষয়ে আল্লাহর সাথে মোনাজাত করছেন তার মর্মার্থ অনুধাবনের চেষ্টা করেন। আল্লাহ তা'আলার দরবারে ভুল-ত্রুটির ক্ষমা চাই এবং তাঁর পবিত্র কালাম সম্পর্কিত এ খেদমতটুকু কবুল করার প্রার্থনা জানাই।

উল্লেখ্য, আমি এ অনুবাদের কাজে রিয়াদস্থ টিচার্স ট্রেনিং কলেজের কুরআন শিক্ষা বিভাগের প্রধান ড. ফাহদ ইবন আব্দুর রহমান ইবন সুলায়মান আল-রুমী কর্তৃক প্রতিপাদিত 'তাফসীরে ফাতিহা-এর কপিটি অনুসরণ করেছি।

আল্লাহ তা'আলাই আমাদের তাওফীক দাতা।

**অনুবাদক**

## এক নজরে শাইখুল ইসলাম মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল ওয়াহ্হাব তামীমী রহ.

শাইখুল ইসলাম মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল ওয়াহহাব রহ. হিজরী দ্বাদশ শতাব্দীর এক অন্যতম ধর্ম সংস্কারক ছিলেন। তিনি ১১১৫ হিজরী মোতাবেক ১৭০৩ খৃষ্টাব্দে সউদী আরবের নাজদ এলাকায় আল-‘উয়াইনা নামক শহরে এক ধর্মপ্রাণ ও সম্মানিত পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। আল ‘উয়াইনা শহরটি সউদী আরবের বর্তমান রাজধানী রিয়াদের প্রায় ৭০ কিলোমিটার উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত।

শাইখ মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল ওয়াহ্হাবের পিতা ছিলেন আল-‘উয়াইনার একজন বিচারপতি। বংশগত দিক দিয়ে তিনি ছিলেন প্রসিদ্ধ তামীম গোত্রীয়। হাম্বালী মাযহাবের তৎকালীন একজন খ্যাতনামা আলেম হিসেবেও তিনি সুপরিচিত ছিলেন।

শাইখ মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল ওয়াহহাব রহ. বার বৎসর বয়সে পদার্পন করার আগেই পবিত্র কুরআন মাজীদ

হিফয করেন। এরপর তার পিতাসহ স্থানীয় উলামাদের কাছে ফিকহ, তাফসীর ও হাদীস শাস্ত্রের অধ্যয়ন শুরু করেন। তারপর তিনি আরো অধিক বিদ্যার্জনের উদ্দেশ্যে সফরে বের হন। প্রথমে হজ পালনের উদ্দেশ্যে মক্কা মুকাররামা গমন করেন। সেখানে থেকে মদীনা মুনাওয়ারা যিয়ারতে যান এবং সেখানকার আলেমগণের নিকট থেকে জ্ঞানার্জন করেন। মদীনায় থাকাকালীন তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কবর ও বাকী‘য়ে গারকাদ (বাকী গোরস্থান)-কে  কেন্দ্র করে কিছু লোকের বিদ‘আত ও অবৈধ ক্রিয়া-কর্মের প্রতি তার তীব্র ক্ষোভ ব্যক্ত করেন এবং তাদের এ জাতীয় কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য নসীহত করেন। অতঃপর তিনি স্বীয় এলাকা নাজদে প্রত্যাবর্তন করেন। কিছু দিন পর তিনি বসরা সফরে বের হন। সেখানে বিদ‘আত ও কুসংস্কার যা দেখতে পেলেন তা ছিল মদীনা মুনাওয়ারায় সংঘটিত কুসংস্কারের চেয়েও অধিক ও মারাত্মক। সেখানে ছিল সজ্জিত কবরসমূহ, কিছু লোক এগুলোর তাওয়াফ করত এবং বরকত লাভের উদ্দেশ্যে মাসেহ (স্পর্শ) করত।

এতদ্ব্যতীত ছিল আরো অনেক বিদ‘আত ও কুসংস্কার, যা দেখে তিনি অত্যন্ত মর্মাহত হন এবং সেখানকার লোকদের এ জাতীয় কাজ করতে নিষেধ করেন।

কিন্তু শাইখ মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল ওয়াহহাবের বিদ‘আত বিরোধী এ ভূমিকা সেখানকার লোকেরা গ্রহণ করতে পারে নি। তারা তাকে বসরা থেকে বের করে দিল। শূন্যপদ, শূন্যহাত ও নগ্নমস্তকে অসহায় অবস্থায় গ্রীষ্মের প্রখর রোদের মাঝে তিনি বসরা থেকে বের হয়ে পড়েন। পথিমধ্যে পিপাসায় মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ার উপক্রম হয়ে উঠেছিল। আল্লাহর রহমতে জুবায়র বাসীরা তাকে আশ্রয় দিয়ে মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা করে।

কথিত আছে যে, তিনি বসরা ত্যাগের পর সিরিয়া অভিমুখে যাওয়ার মনস্থ করেছিলেন; কিন্তু আর্থিক অসুবিধার জন্য সেদিকে না গিয়ে আল-আহসার পথে নাজদ প্রত্যাবর্তন করেন।

দেশে ফিরে শাইখ মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল ওয়াহহাব হারীমলা নামক শহরে পিতার সাথে অবস্থান শুরু করেন।

ইতিঃপূর্বে তার পিতা আল-‘উয়াইনা থেকে হারীমলায় বদলি হয়ে যান। হিজরী ১১৫৩ সনে তার পিতা মারা যান। পিতার মৃত্যুর পর তিনি একাই দাওয়াত ও সংস্কারের কাজে সমূহ বাধা-বিপত্তি মোকাবেলা করতে থাকেন। এ সময়ে তিনি তাওহীদের ওপর বই লিখা শুরু করেন। বিভিন্ন দিক থেকে প্রবল বিরোধিতা সত্বেও তার সুনাম ও দাওয়াতের খবর চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। অতঃপর হারীমলাবাসীরা তার দাওয়াত ও সংস্কারমূলক কাজে একমত হতে না পেরে তাকে সেখান থেকে বিতাড়িত করে দেয়। এক পর্যায়ে তাকে হত্যা করারও ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ তা‘আলা তাকে রক্ষা করেন। এরপর তিনি আল- ‘উয়াইনায় উপস্থিত হন। সেখানকার শাসক তাকে স্বাগত জানান এবং তার প্রতি উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করেন। সেখানে তিনি বিভিন্ন সমাধির উপর তৈরি অনেক গম্বুজ ও নানাবিধ কুসংস্কারের কেন্দ্রগুলো ধ্বংস করেন এবং খাঁটি তাওহীদের বার্তা লোক সমাজে প্রচার করতে থাকেন।

এখানেও শাইখ মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল ওয়াহহাব হিংসুক ও সংস্কার বিরোধী লোকদের ষড়যন্ত থেকে রেহাই পান নি। অবশেষে এখান থেকেও তাকে বিদায় নিতে হলো। অতঃপর তিনি রিয়াদের নিকবর্তী দার‘ইয়া নামক শহরে উপনীত হন। সেখানকার শাসক আমীর ‘মুহাম্মাদ ইবন সউদ’ তাকে স্বাগত জানান এবং দীনে হকের প্রচার এবং সুন্নাতে রাসূলকে জীবন্ত ও বিদ‘আত নির্মূল অভিযানে সব রকমের সাহায্য-সহায়তার নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

এমনিভাবে দার‘ইয়া শহরকে কেন্দ্র করে শাইখ মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল  ওয়াহহাব দীনের দাওয়াত পুনরোদ্দমে শুরু করেন। নিকটবর্তী ও দূরবর্তী এলাকার শাসক, গোত্রীয় প্রধান ও আলেমবর্গের প্রতি দাওয়াত ও সংস্কারের কাজে তার সাথে যোগ দেওয়ার জন্য পত্র লিখে আহ্বান জানান। ফলে অনেকেই তার আহ্বানে সাড়া দিয়ে সংস্কার ও দাওয়াতের কাজে ঝাপিয়ে পড়ে।

এখানে উল্লেখ্য, দার‘ইয়া আগমনের পর আমীর ‘মুহাম্মাদ ইবন সউদ’ ও শাইখ মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল ওহ্হাবের

মধ্যে হিজরী ১১৫৭ সনে দাওয়াত ও সংস্কারের ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সাহায্যের যে ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল তা 'দার'ইয়া চুক্তি' নামে পরিচিত। প্রকৃতপক্ষে এ চুক্তিটি সংস্কারমূলক আন্দোলন এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় জাগরণে গোটা আরব উপদ্বীপ তথা আধুনিক মুসলিম বিশ্বে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ ছিল। নির্মল তাওহীদ ও শরী'আতের বিধি-বিধানের দিকে প্রত্যাবর্তনের এ আহ্বান নাজদ এলাকায় এক ধর্মীয় পুনঃজাগরণের প্রবাহ সৃষ্টি করে। যথাযথভাবে সালাত প্রতিষ্ঠা হয়, বিদ'আত, কুসংস্কার, শির্ক ও অবৈধ কর্মাদি বিলুপ্ত হয় এবং দিকে দিকে খাঁটি তাওহীদের বাণী ছড়িয়ে পড়ে।

শাইখ মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল ওয়াহহাব ইত্যবসরে ইবাদাত, তা'লীম ও ওয়াজ নসীহতে মনোনিবেশ করেন এবং একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বই-পুস্তক রচনা করেন। তন্মধ্যে তাওহীদ, ঈমান, ফাযাইলে ইসলাম, কাশফুশ শুবুহাত ও মাসাইলে জাহেলিয়া ছিল অন্যতম।

প্রকৃত তাওহীদের বার্তাবাহক, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে দুর্জয় সেনা ও শরী‘আতের বিধি-বিধান বাস্তবায়নের আপোষহীন সংগ্রামী এ মহান ধর্মীয় নেতা শাইখ মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল ওয়াহহাব রহ. ১২০৬ হিজরী সনে দার‘ইয়ায় ইন্তেকাল করেন। আল্লাহ তা‘আলা তার ওপর রহমত বর্ষণ করুন। আমীন।

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

প্রিয় পাঠক! (আল্লাহ তা'আলা আপনাকে তাঁর আনুগত্যের পথে পরিচালিত করুন, আপনাকে তাঁর হিফাযতের আওতায় পরিবেষ্টিত রাখুন এবং দুনিয়া ও আখেরাতে তিনি আপনার অভিভাবকত্ব গ্রহণ করুন।) জেনে রাখুন, সালাতের প্রাণ অর্থাৎ মূল উদ্দেশ্যে হলো এর মধ্যে অন্তরকে আল্লাহ তা'আলার প্রতি নিবিষ্ট রাখা। সুতরাং যদি কোনো সালাত উপস্থিত ও নিবিষ্ট অন্তর ব্যতিরেকে আদায় করা হয় তাহলে তা হবে প্রাণহীন দেহের মতো অসার। এর প্রমাণ আল্লাহ তা'আলার বাণী:

﴿فَوَيۡلٞ لِّلۡمُصَلِّينَ ٤ ٱلَّذِينَ هُمۡ عَن صَلَاتِهِمۡ سَاهُونَ ٥﴾

[الماعون: ٤، ٥]

"সেই সব মুসল্লীদের জন্য ধ্বংস অনিবার্য, যারা তাদের সালাত সম্পর্কে উদাসীন।" [সূরা আল-মা'উন, আয়াত: ৪-৫]

এখানে السهو (উদাসীনতা) এর ব্যাখ্যায় যারা বলা হয়; নির্ধারিত সময়ে সালাত আদায়ে উদাসীনতা, সালাতের

মধ্যে পালনীয় ওয়াজিব সম্পর্কে উদাসীনতা এবং সালাতে আল্লাহর প্রতি অন্তর হাযির ও নিবিষ্টতা করতে উদাসীনতা। সহীহ মুসলিমে বর্ণিত একটি হাদীস উপরোক্ত ব্যাখ্যা প্রমাণ করে। উক্ত হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

«تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ، تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ، تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ، يَجْلِسُ يَرْقُبُ الشَّمْسَ حَتَّى إِذَا كَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ، قَامَ فَنَقَرَهَا أَرْبَعًا، لَا يَذْكُرُ اللهَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا»

“এটা মুনাফিকের সালাত, এটা মুনাফিকের সালাত, এটা মুনাফিকের সালাত, সে সূর্যের দিকে চেয়ে থাকে, যখনই সূর্য অস্ত যাওয়ার সন্ধিক্ষণে শয়তানের শিংদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে পৌঁছে, তখন সে দাঁড়িয়ে তড়িঘড়ি করে চার রাকাত

সালাত এমন ভাবে পড়ে নেয় যার মধ্যে সে আল্লাহর যিকির অল্পই করে থাকে"[2]

এখানে (সূর্যের দিকে চেয়ে থাকে) দ্বারা সময়ের অপচয়, (তড়িঘড়ি করে চার রাকাত সালাত পড়া) দ্বারা সালাতের রুকনগুলো সঠিকভাবে পালন না করা এবং (সে আল্লাহর যিকির অল্পই করে থকে) দ্বারা নিবিষ্ট ও স্থিরচিত্ত না হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। একথা অনুধাবনের পর পাঠক মহোদয় সালাতের অন্তর্ভুক্ত এক বিশেষ রুকন ও ইবাদাত উপলব্ধি করার চেষ্টা করুন, আর তা হলো 'সূরা আল-ফাতিহা' পড়া, যাতে আল্লাহ তা'আলা আপনার সালাত বহুগুণ সাওয়াব বিশিষ্ট পাপ মোচনকারী মকবুল সালাতের মধ্যে গণ্য করে নেন।

সূরা আল-ফাতিহা সঠিকভাবে অনুধাবনের পথ উন্মুক্ত করার এক সর্বোত্তম সহায়ক হলো সহীহ মুসলিমে

---

2. সহীহ মুসলিম (আল-মাসজিদ); আবু দাউদ (আস-সালাত); তিরমিযী (মাওয়াকীতে সালাত); নাসাঈ (মাওয়াকীতে সালাত) ও মুসনাদে আহমদ

সংকলিত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু কর্তৃক বর্ণিত একটি বিশুদ্ধ হাদীস। তিনি বলেন: আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তা'আলা বলেন: (আমি সালাত (সূরা আল-ফাতিহা) আমার ও আমার বান্দাদের মধ্যে অর্ধেক অর্ধেক ভাগ করে নিয়েছি, আর আমার বান্দা যা চাইবে তা-ই তাকে দেওয়া হবে।) বান্দা যখন বলে:

﴿ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ٢﴾ [الفاتحة: ٢]

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য।" [সূরা আল-ফাতিহা, আয়াত: ২]

আল্লাহ তা'আলা তখন বলেন: (আমার বান্দা আমার প্রশংসা করলো।)

যখন বান্দা বলে:

﴿ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ٣﴾ [الفاتحة: ٣]

"পরম করুণাময় অতি দয়ালু।" [সূরা আল-ফাতিহা, আয়াত: ৩]

তখন আল্লাহ বলেন: (আমার বান্দা আমার গুণগান করলো।)

যখন বান্দা বলে:

﴿مَٰلِكِ يَوۡمِ ٱلدِّينِ ۝٤﴾ [الفاتحة: ٤]

“প্রতিফল দিবসের মালিক।” [সূরা আল-ফাতিহা, আয়াত: ৪]

তখন আল্লাহ বলেন: (আমার বান্দা আমার মর্যাদা বর্ণনা করলো।)

যখন বান্দা বলে:

﴿إِيَّاكَ نَعۡبُدُ وَإِيَّاكَ نَسۡتَعِينُ ۝٥﴾ [الفاتحة: ٥]

“আমরা তোমারই ইবাদাত করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য চাই।” [সূরা আল-ফাতিহা, আয়াত: ৫]

তখন আল্লাহ বলেন: (এটা আমার ও আমার বান্দার মধ্যে বিভক্ত এবং বান্দার জন্য তা-ই রয়েছে যা সে চাইবে।)

অতঃপর যখন বান্দা বলে:

﴿ٱهۡدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلۡمُسۡتَقِيمَ ٦ صِرَٰطَ ٱلَّذِينَ أَنۡعَمۡتَ عَلَيۡهِمۡ غَيۡرِ ٱلۡمَغۡضُوبِ عَلَيۡهِمۡ وَلَا ٱلضَّآلِّينَ ٧﴾ [الفاتحة: ٦، ٧]

“আমাদের সরল পথ দেখাও। তাদের পথ যাদের তুমি নি‘আমত দিয়েছ, তাদের পথ নয় যারা গযবপ্রাপ্ত এবং পথভ্রষ্ট।” [সূরা আল-ফাতিহা, আয়াত: ৬-৭]

তখন আল্লাহ তা‘আলা বলেন: (এসব তো আমার বান্দার জন্য এবং আমার বান্দা যা চাইবে তার জন্য তা-ই রয়েছে।)[3] (হাদীস সমাপ্ত)

বান্দা যখন একথা চিন্তা করবে এবং জানতে পারবে যে, সূরা আল-ফাতিহা দু’ভাগে বিভক্ত, প্রথম ভাগ إياك نعبد পর্যন্ত আল্লাহর জন্য, আর দ্বিতীয় ভাগ অর্থাৎ তার পর থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত, যা বলে বান্দা দো‘আ করে, তার নিজের জন্য এবং একথাও যখন সে চিন্তা করবে যে, যিনি এ দো‘আ তাকে শিক্ষা দিয়েছেন তিনি হলেন

---

3. সহীহ মুসলিম (আস-সালাত); আবু দাউদ (আস-সালাত); তিরমিযী (তাফসীরে কুরআন) এবং নাসাঈ (আল-ইফতেতাহ)।

কল্যাণময় মহান আল্লাহ। তিনি তাকে এ দো‘আ পড়ার এবং প্রতি রাকাতে তা বারবার ব্যক্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তা‘আলা দয়া ও করুণাবশতঃ এ দো‘আ কবুলের নিশ্চয়তাও দিয়েছেন, যদি বান্দা নিষ্ঠা ও উপস্থিত চিত্তে তা করে থাকে, তখন তার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, অধিকাংশ লোক অবহেলা ও উদাসীনতার ফলে সালাতে নিহিত কি মূল্যবান সম্পদ হারিয়ে থাকে!

কবিতা:

قد هيؤك لأمر لو فطـــــــنت له

فاربأ بنفسك أن ترعى مـع الهمل

وأنت في غفلة عما خلقـــت له

وأنت في ثقة من وثبة الأجـــل

فزك بنفسك مما قد يدنـــــسها

واختر لها ما ترى من خالص العمل

أأنت في سكرة ام أنت مـــــنتبها

অর্থ: তোমাকে তো মহৎ কাজের জন্য তৈরী করেছে, হায়! তুমি যদি তা আঁচ করে নিতে। অতএব, ঐসব অবাঞ্ছিত লোকদের থেকে নিজেকে দূরে রাখ।

'তুমি তোমার সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে উদাসীন এবং অহেতুক বিশ্বাস কর যে, মৃত্যু তোমাকে সহজে পাকড়াও করবে না।'

'যা তোমার আত্মাকে কলুষিত করতে পারে তা থেকে তুমি উহা পবিত্র রাখ এবং এর মঙ্গলের জন্য খালেছ নেক আমল অর্জন কর।'

'তুমি কি বিভোর না সতর্ক? নিরাপদ তোমায় প্রবঞ্চনা দিল, না অভিলাষ তোমাকে অমনোযোগী করে ফেলেছে?'

প্রিয় পাঠক! আমি এ মহান সূরার কিছু মর্মার্থ এখানে পেশ করছি। আশা করি, আপনি উপস্থিত চিত্তে সালাত পড়বেন এবং মুখে যা ব্যক্ত করেন তা যেন আপনার অন্তর উপলব্ধি করে থাকে। কেননা মুখে যা উচ্চারিত হয় তা যদি অন্তর বিশ্বাস না করে তাহলে এটা কোনো নেক

কাজ হিসেবে পরিগণিত হয় না। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿يَقُولُونَ بِأَلۡسِنَتِهِم مَّا لَيۡسَ فِي قُلُوبِهِمۡۚ﴾ [الفتح: ١١] “তারা মুখে মুখে এমন কথা বলে যা তাদের অন্তরে নেই।” [সূরা আল-ফাতহ, আয়াত: ১১]

এখন সংক্ষিপ্তাকারে প্রথমে ‘ইস্তে‘আযা’ (আউযুবিল্লাহ) এবং পরে ‘বাসমালাহ’ (বিসমিল্লাহ)-এর অর্থগত বর্ণনা দিয়ে সূরা আল-ফাতিহা-এর বর্ণনা শুরু করছি:

## ‘ইস্তে‘আযা’ (আউযুবিল্লাহর তাফসীর)

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.

“আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি আল্লাহর কাছে বিতাড়িত শয়তান থেকে”।

এর অর্থ হলো: আমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করি, তাঁর দরবারে নিরাপত্তা কামনা করি এ মানব শত্রু বিতাড়িত শয়তানের অনিষ্ট থেকে, যাতে সে আমার ধর্মীয় বা পার্থিব কোনো ক্ষতি সাধন করতে না পারে, আমি যে বিষয়ে

আদিষ্ট তা সম্পাদনে সে যেন আমাকে বাধা দিতে না পারে এবং যা নিষিদ্ধ তার প্রতি সে যেন আমাকে উদ্বুদ্ধ করতে না পারে। কেননা যখন বান্দা সালাত, কুরআন তিলাওয়াত বা অন্য কোনো কল্যাণকর কাজের ইচ্ছা পোষণ করে থাকে, তখন এ শয়তান তাকে বিভ্রান্ত করার জন্য তৎপর হয়ে উঠে।

আর তা এ জন্য যে, আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা ব্যতিরেকে আপনার পক্ষে শয়তানকে দূর করার কোনো উপায় নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ إِنَّهُۥ يَرَىٰكُمۡ هُوَ وَقَبِيلُهُۥ مِنۡ حَيۡثُ لَا تَرَوۡنَهُمۡۗ ﴾ [الاعراف: ٢٧]

“সে (শয়তান) ও তার দলবল তোমাদের এমনভাবে দেখতে পায় যে, তোমরা তাদের দেখতে পাও না।” [সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত: ২৭]

সুতরাং আপনি যখন আল্লাহর কাছে শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করবেন এবং তাঁকে আঁকড়ে ধরবেন তখন তা সালাতের মধ্যে আপনার আন্তরিক উপস্থিতি বা একাগ্রচিত্ত হওয়ার একটি প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়াবে। অতএব,

আপনি এ বাক্যের মর্মার্থ ভালোভাবে অনুধাবন করবেন এবং অধিকাংশ লোকের ন্যায় শুধু মুখে মুখে তা ব্যক্ত করে ক্ষান্ত হবেন না।

## ‘বাসমালাহ’ (বিসমিল্লাহ-এর তাফসীর)

﴿بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ﴾ ‘বিসমিল্লাহ’ (আল্লাহর নামে) এর অর্থ হলো: আমি এ কাজে -পড়া, দো‘আ বা অন্য কিছুই হোক নিয়োজিত হলাম আল্লাহর নামে, আমার শক্তি সামর্থ্যের বলে নয়, বরং এ কাজ সম্পাদন করতে যাচ্ছি আল্লাহ তা‘আলার সাহায্যে, তাঁর কল্যাণময় ও মহান নামের বরকত কামনা করে। দীনি ও পার্থিব প্রতিটি কাজের প্রারম্ভে এ ‘বাসমালাহ’ পড়তে হয়। সুতরাং যখন আপনি মনে করবেন যে, আপনার এ পড়া কেবল আল্লাহরই সাহায্য নিয়ে শুরু হচ্ছে, স্বীয় শক্তি সামর্থের তোয়াক্কা করে নয়, তখন তা আপনার অন্তরের উপস্থিতি ও যাবতীয় কল্যাণ লাভের পথে সমূহ প্রতিবন্ধক দূরীকরণে প্রধান সহায়ক হয়ে থাকবে।

﴿ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ﴾ “পরম করুণাময় অতি দয়ালু।”

রহমত থেকে উদ্ভুত গুণবাচক দু'টি নাম। তন্মধ্যে একটি অপরটির চেয়ে অধিকতর অর্থবহ। যেমন, সর্বজ্ঞ ও অতি জ্ঞানী। ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেন, এ গুণবাচক নাম দু'টি অতি সূক্ষ্ম, তন্মধ্যে একটি অপরটির চেয়ে অধিকতর সূক্ষ্ম অর্থাৎ অধিক রহমত সম্পন্ন।

# সূরা আল-ফাতিহা-এর তাফসীর

সূরা আল-ফাতিহা সাতটি আয়াতের সমষ্টি। প্রথম তিন আয়াতে ও চতুর্থ আয়াতের প্রথমার্ধ আল্লাহর জন্য এবং চতুর্থ আয়াতের দ্বিতীয়ার্ধসহ শেষ তিন আয়াত বান্দার জন্য। সূরার প্রথম আয়াত:

﴿ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ٢﴾ [الفاتحة: ٢]

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি সৃষ্টিকুলের রব।"

জেনে রাখুন, ٱلۡحَمۡدُ এর অর্থ ঐচ্ছিক উপকার সাধনের উপর মৌখিক প্রশংসা ব্যক্ত করা। মৌখিক প্রশংসা বলে কাজের মাধ্যমে যে প্রশংসা হয় তা পৃথক করে দেওয়া হলো। কাজের মাধ্যমে প্রশংসা যাকে লিসানুল হাল বা অবস্থার ভাষা বলা হয়, মূলত তা কৃতজ্ঞতারই এক প্রকার। ঐচ্ছিক উপকার বলে এমন কাজই বুঝানো হয়েছে যা মানুষ আপন ইচ্ছায় করে থাকে। আর যে উপকার বা উত্তম কাজে মানুষের কোনো হাত নেই, যেমন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ইত্যাদি, এমন বিষয়ের ওপর প্রশংসা করাকে হামদ না বলে মাদহ বলা হয়ে থাকে। হামদ এবং

শুকর এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য হলো: হামদের মধ্যে গুণাবলী বর্ণনাসহ প্রশংসা করা, তা প্রশংসাকারীর প্রতি কোনো ইহসানের বিনিময়ে সাধিত হোক অথবা বিনিময় ছাড়া হোক। আর শুকর কেবল কৃতজ্ঞের প্রতি ইহসানের বিনিময়ই হয়ে থাকে। এ দিক দিয়ে শুকরের চেয়ে হামদ ব্যাপক। কেননা হামদ এর মধ্যে গুণাবলী ও ইহসান উভয়ই অন্তর্ভুক্ত।

তাই আল্লাহ তা‘আলার হামদ করা হয় তাঁর সর্ব সুন্দর নামসমূহ এবং পূর্বাপর তাঁর সমুহ সৃষ্টির ওপর। এ জন্য আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿ ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَمۡ يَتَّخِذۡ وَلَدٗا﴾ [الاسراء: ١١١] “আল্লাহ তা‘আলারই সকল প্রশংসা যিনি কোনো সন্তান গ্রহণ করেন নি।” [সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ১১১]

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন:

﴿ ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ﴾ [الانعام: ١]

“আল্লাহ তা‘আলারই সকল প্রশংসা যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন।” [সূরা আল-আন‘আম, আয়াত: ১]

এ প্রসঙ্গে কুরআন মাজীদে আরো অনেক আয়াত রয়েছে।

শুকর কেবল দান বা অনুগ্রহের বিনিময়েই হয়ে থাকে। তাই এদিক দিয়ে এর প্রয়োগ উক্ত হামদের চেয়ে সীমিত। তবে তার প্রয়োগ অন্তর, হাত ও ভাষার মাধ্যমে ব্যক্ত হতে পারে। এ জন্য আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন:

﴿ٱعۡمَلُوٓاْ ءَالَ دَاوُۥدَ شُكۡرٗاۚ﴾ [سبا: ١٣] “হে দাউদ বংশধরগণ! কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তোমরা নেক কাজ করে যাও।” [সূরা সাবা, আয়াত: ১৩]

পক্ষান্তরে হামদ কেবল অন্তর এবং ভাষার মাধ্যমেই ব্যক্ত করা হয়। এ দিক দিয়ে শুকর তার বিভিন্ন প্রকার অনুসারে অধিকতর ব্যাপক এবং হামদ তার উপলক্ষের দিক দিয়ে অধিকতর ব্যাপক।

ٱلۡحَمۡدُ এর আলিফ ও লাম সার্বিক বা বর্গীয় অর্থে ব্যবহৃত। অর্থাৎ সর্ববিধ প্রশংসা এর অন্তর্গত এবং সবই

আল্লাহ তা‘আলার জন্য, অন্য কারো জন্য নয়। এমন সব কাজ যাতে মানুষের কোনো হাত নেই, যেমন মানুষ সৃষ্টি, চক্ষু, অন্তর ইত্যাদি সৃষ্টি, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি এবং জীবিকারাজি প্রদান ইত্যাদি -এ জাতীয় কাজের ওপর আল্লাহর প্রশংসা স্পষ্ট। আর যেসব কাজের ওপর মখলুক প্রশংসা কুড়ায়, যেমন নেক বান্দা ও নাবী-রাসূলগণ যে সব কাজের জন্য প্রশংসিত হন, এভাবে কেউ কোনো মঙ্গল কাজ করলে, বিশেষ করে তা যদি আপনার উদ্দেশ্যে করে থাকে, এ সমস্ত প্রশংসাও আল্লাহ তা‘আলার প্রাপ্য। তা এ অর্থে যে, আল্লাহ তা‘আলাই এ কর্তাকে সৃষ্টি করেছেন, তাকে এ কাজ করার উপকরণ প্রদান করেছেন এবং তাকে এ কাজের ওপর আগ্রহী ও সমর্থ্য করেছেন। এ ছাড়া আরো অনেক অনুগ্রহ দান করেছেন যার কোনো একটির অবর্তমানে এ কর্তা ব্যক্তি প্রশংসিত হতে পারে না। এ দৃষ্টিতেই সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই প্রাপ্য।

﴿لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ﴾ “আল্লাহর জন্য যিনি সৃষ্টিকুলের রব।”

‘আল্লাহ’ আমাদের মহান ও কল্যাণময় প্রতিপালকের নাম। এর অর্থ: ইলাহ অর্থাৎ মা‘বুদ (উপাস্য)।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿وَهُوَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَفِي ٱلۡأَرۡضِ﴾ [الانعام: ٣] “এবং তিনিই আল্লাহ আকাশমণ্ডলীতে ও পৃথিবীতে।” [সূরা আল-আন‘আম, আয়াত: ৩]

অর্থাৎ তিনি মা‘বুদ আকাশমণ্ডলীতে এবং মা‘বুদ এ পৃথিবীতে। তিনি অন্যত্র বলেন:

﴿إِن كُلُّ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ إِلَّآ ءَاتِي ٱلرَّحۡمَٰنِ عَبۡدٗا ۝٩٣ لَّقَدۡ أَحۡصَىٰهُمۡ وَعَدَّهُمۡ عَدّٗا ۝٩٤﴾ [مريم: ٩٣، ٩٤]

“আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে এমন কেউ নেই যে, দয়াময় আল্লাহর নিকট বান্দারূপে উপস্থিত হবে না। তিনি তাদেরকে পরিবেষ্টন করে আছেন এবং তাদেরকে বিশেষভাবে গণনা করে রেখেছেন।” [সূরা মারয়াম, আয়াত: ৯৩-৯৫]

رب এর অর্থ প্রভু, প্রতিপালক, নিয়ন্তা। العالمين একবচনে العالم মহান কল্যাণময় আল্লাহ বাদে সব কিছুকে 'আলম নামে আখ্যায়িত করা হয়। আল্লাহ বাদে প্রত্যেক বাদশাহ, নবী, মানুষ, জিন্ন ইত্যাদি প্রতিপালিত, বশবর্তী, নিয়ন্ত্রিত, ফকীর ও মুখাপেক্ষী। সবই এক মহান সত্তার প্রতি সম্পর্কিত -এতে তার কোনো শরীক নেই। তিনিই একমাত্র পরমুখাপেক্ষীবিহীন সত্তা এবং তাঁরই প্রতি সর্ব বিষয় সম্পর্কিত।[4]

এরপর আল্লাহ তা'আলা উল্লেখ করেন: مَٰلِكِ يَوۡمِ ٱلدِّينِ অন্য ক্বিরাতে আছে: مَلِكِ يَوۡمِ ٱلدِّينِ এখানে দ্রষ্টব্য যে, আল্লাহ তা'আলা কুরআনের প্রথম সূরার একই স্থানে যেভাবে উলুহিয়্যাহ, রুবুবিয়্যাহ ও মুলকের বা আধিপত্যের উল্লেখ করেছেন, সেভাবে কুরআনের শেষ সূরায় এগুলোর উল্লেখ করে তিনি বলেন:

---

4. ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ এর অর্থ বিসমিল্লাহ-এর ব্যাখ্যায় দ্রষ্টব্য।

﴿قُلۡ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ١ مَلِكِ ٱلنَّاسِ ٢ إِلَٰهِ ٱلنَّاسِ ٣﴾ [الناس: ١، ٣]

“বলুন (হে রাসূল) আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি মানুষের রবের, মানুষের অধিপতির, মানুষের মা‘বুদের।” [সূরা আন-নাস, আয়াত: ১-৩] মহান কল্যাণময় আল্লাহ কুরআনের প্রথম দিকে এক স্থানে তাঁর এ তিনটি গুণের উল্লেখ করেছেন, আবার এ গুণাত্রয় কুরআনের শেষাংশে এক স্থানে একত্রে উল্লেখ করেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি নিজের মঙ্গল চায় তার উচিৎ এ স্থানদ্বয়ের প্রতি মনোযোগ প্রদান করা এবং এ সম্পর্কে গবেষণা ও পর্যালোচনায় সচেষ্ট হওয়া। তার আরো জানা উচিৎ যে, মহাজ্ঞানী আল্লাহ তা‘আলা কুরআনের প্রথমে, আবার কুরআনের শেষাংশে একত্রে এগুলোর উল্লেখ একসাথে করেছেন। কেবল এ উদ্দেশ্যে যে, এগুলোর মর্মার্থ অনুধাবন করা এবং এগুলোর পরস্পরের মধ্যে অর্থগত ব্যবধান সম্পর্কে বান্দার অবগত হওয়া অতীব প্রয়োজন। প্রতিটি গুণের একটা নির্দিষ্ট অর্থ রয়েছে যা অন্যটির মধ্যে নেই। যেমন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর

তিনটি গুণ, আল্লাহর রাসূল, সর্বশেষ নবী এবং আদম সন্তান। মোটকথা: এর প্রত্যেকটির এক একটি অর্থ রয়েছে যা অন্যটি থেকে ভিন্ন।

যখন এ কথা জানা হলো যে, 'আল্লাহ' অর্থ 'ইলাহ' এবং ইলাহ যিনি তিনিই মা'বুদ। অতঃপর তুমি তাকে ডাকো তাঁর নামে কুরবানী করো বা তাঁর নামে মান্নত করো, তখন সত্যিকারভাবে তুমি বিশ্বাস করলে যে, তিনিই আল্লাহ। আর যদি কোনো সৃষ্টিকে ডাকো ভালো হউক আর মন্দ হউক বা তাঁর নামে কুরবানী বা তাঁর নামে মান্নত করো তাহলে তোমার বিশ্বাস হলো যে এটাই তোমার আল্লাহ। এভাবে যদি কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে জানা যায় যে, সে তার জীবনের ক্ষণিকের জন্য হলেও 'শামসান'[5] অথবা 'তাজ'[6] কে আল্লাহ হিসেবে বিশ্বাস

---

[5]. শামসান: প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ ইবন শামসান। তার ছেলেরা তার নামে মান্নত করার জন্য লোকদের নির্দেশ দিত। লোক তাকে বিশেষ অলী ও শাফা'আতের অধিকারী হিসেবে বিশ্বাস করত।

করেছে, তাহলে সে বনী ইসরাঈলের পর্যায়ে পতিত হবে, যখন তারা গো বৎসের পূজা করেছিল। অতঃপর যখন তাদের কাছে তাদের ভ্রান্তি ধরা পড়লো তখন তারা ভীত-সন্ত্রস্ত্র ও অনুতপ্ত হয়ে যা বলেছিল আল্লাহ তা'আলা কুরআনে তা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন:

﴿ وَلَمَّا سُقِطَ فِيٓ أَيۡدِيهِمۡ وَرَأَوۡاْ أَنَّهُمۡ قَدۡ ضَلُّواْ قَالُواْ لَئِن لَّمۡ يَرۡحَمۡنَا رَبُّنَا وَيَغۡفِرۡ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ ١٤٩ ﴾ [الاعراف: ١٤٩]

"অতঃপর যখন তারা অনুতপ্ত হলো এবং বুঝতে পারল যে, আমরা নিশ্চিতই গোমরাহ হয়ে পড়েছি, তখন বলতে লাগল, আমাদের প্রতি যদি আমাদের রব ক্ষমা ও করুণা না করেন তাহলে অবশ্যই আমরা ধ্বংস (সর্বনাশগ্রস্থ) হয়ে যাবো।" (সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত: ১৪৯]

---

6. রিয়াদের অদূরে 'আল-খারজ' এলাকার অধিবাসী ছিল। লোক তাকে বিশেষ অলী ও অনেক অলৌকিক শক্তির অধিকারী বলে বিশ্বাস করত। তার নামে মান্নত জমা করা হত। শাসকবৃন্দ তাকে ও তার অনুসারীদের ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত ছিল। তাজ ও শামসানের দ্বারা নজদ এলাকায় অনেক লোক বিভ্রান্ত হয়েছিল।

(رب) এর অর্থ হলো মালিক, নিয়ন্ত। আল্লাহ তা'আলা সব কিছুর মালিক এবং তিনি সব কিছুর নিয়ন্তা -এটি ধ্রুব সত্য। যাদের বিরুদ্ধে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধ করেছেন, সেই প্রতিমাপূজকরা আল্লাহর এ গুণ স্বীকার করত। আল্লাহ তা'আলা এ সম্পর্কে কুরআন মাজীদের একাধিক স্থানে বর্ণনা করেছেন। যেমন, সূরা ইউনুসের এক আয়াতে বলেন:

﴿قُلۡ مَن يَرۡزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلۡأَرۡضِ أَمَّن يَمۡلِكُ ٱلسَّمۡعَ وَٱلۡأَبۡصَٰرَ وَمَن يُخۡرِجُ ٱلۡحَيَّ مِنَ ٱلۡمَيِّتِ وَيُخۡرِجُ ٱلۡمَيِّتَ مِنَ ٱلۡحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلۡأَمۡرَۚ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُۚ فَقُلۡ أَفَلَا تَتَّقُونَ ٣١﴾ [يونس: ٣١]

"(হে রাসূল) আপনি জিজ্ঞেস করুন, কে রিযিক দান করেন তোমাদেরকে আকাশ থেকে ও পৃথিবী থেকে? কিংবা কে তোমাদের কান বা চোখের মালিক? কে জীবিতকে মৃতের ভেতর থেকে বের করেন, কে-ইবা মৃতকে জীবিতদের মধ্য থেকে বের করে? কে করে কর্ম সম্পাদনের ব্যবস্থাপনা? তখন তারা বলে উঠবে, আল্লাহ।

তখন আপনি বলুন, তারপরও কি তোমরা আল্লাহকে ভয় করবে না।” [সূরা ইউনুস, আয়াত: ৩১]

সুতরাং যে ব্যক্তি বিপদ মুক্তি ও প্রয়োজন সাধনের উদ্দেশ্যে আল্লাহকে ডাকে এবং পরে এ উদ্দেশ্যে কোনো মাখলুককেও ডাকে, বিশেষ করে মাখলুককে ডাকার সাথে তার ইবাদাতের সাথে নিজের সম্পর্ক সংশ্লিষ্ট করে ফেলে, যেমন সে ডাকার সময় বলে, অমুক তোমার বান্দা বা অলীর বান্দা বা নবীর বান্দা অথবা যুবাইরের বান্দা. তখন এর দ্বারা সে সেই মাখলুকের রুবুবিয়্যাত স্বীকার করে নিল এবং সমগ্র বিশ্বের রব হিসেবে আল্লাহকে স্বীকার করল না; বরং তার রুবুবিয়্যাতের কিছু অংশ অস্বীকার করে বসল।

আল্লাহ তা‘আলা সে বান্দাকে রহম করুন, যে নিজেকে নসীহত করে এবং এ জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অনুধাবনের চেষ্টা করে আর এ সম্পর্কে সীরাতে মুস্তাকীমের অনুসারী আলেমগণের ভাষ্য জিজ্ঞেস করে। তারা সূরাটির ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন কিনা?

(الملك) শব্দের ব্যাখ্যা একটু পরে আসছে ইনশা-আল্লাহ।

আল্লাহ তা‘আলার বাণী:

﴿مَٰلِكِ يَوۡمِ ٱلدِّينِ ٤﴾ [الفاتحة: ٤]

“প্রতিফল দিবসের মালিক।” [সূরা আল-ফাতিহা, আয়াত: ৩] অন্য ক্বিরাতে:

﴿مَلِكِ يَوۡمِ ٱلدِّينِ ٤﴾ [الفاتحة: ٤] “প্রতিফল দিবসের অধিপতি।” [সূরা আল-ফাতিহা, আয়াত: ৩]

উভয় আকারে সকল ভাষ্যকারদের নিকট এর অর্থ তা-ই যা আল্লাহ তা‘আলা তাঁর নিম্নোক্ত বাণীতে ব্যক্ত করেছেন। তা হলো:

﴿وَمَآ أَدۡرَىٰكَ مَا يَوۡمُ ٱلدِّينِ ١٧ ثُمَّ مَآ أَدۡرَىٰكَ مَا يَوۡمُ ٱلدِّينِ ١٨ يَوۡمَ لَا تَمۡلِكُ نَفۡسٞ لِّنَفۡسٖ شَيۡـٔٗاۖ وَٱلۡأَمۡرُ يَوۡمَئِذٖ لِّلَّهِ ١٩﴾ [الانفطار: ١٧، ١٩]

“আর, তুমি কর্মফল দিবস সম্পর্কে কি জান? আবার, কর্মফল দিবস সম্পর্কে তুমি কি জান? সেদিন কেউ কারো জন্য কিছু করার ক্ষমতা রাখবে না। সেদিন ক্ষমতা

থাকবে শুধু আল্লাহর হাতে ।” [সূরা ইনফিতার, আয়াত: ১৭-১৯]

যে ব্যক্তি এ আয়াতের ব্যাখ্যা সঠিকভাবে অনুধাবন করবে এবং জানতে পারবে যে, কর্মফল দিবস ও অন্যান্য দিবসসহ সব কিছুর মালিক আল্লাহ তা‘আলা হওয়া সত্বেও এ দিনের (কিয়ামতের) অধিকারকে তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন সে উপলব্ধি করতে পারবে যে, এখানে সেই মহান বিষয়টিকেই খাছ করে উদ্দেশ্যে করা হয়েছে, যা অনুধাবন করে যে জান্নাতে যাওয়ার সে এবং যা পরিজ্ঞাত না হয়ে যে জাহান্নামে যাওয়ার সে যাবে। বিষয়টি অর্থাৎ ‘কিয়ামতের দিন সম্পর্কে অধিকার একমাত্র আল্লাহ তা‘আলার’ এ অর্থ কত-ই না মহান, যার ওপর বিশ বছর ধরে চিন্তা-ভাবনা করলেও এর যথাযথ হক আদায় সম্ভব হবে না। কোথায় সে মর্মার্থ ও এর প্রতি বিশ্বাস এবং কুরআন কর্তৃক স্পষ্টভাবে ব্যক্ত বিষয়ের ওপর ঈমান আর কোথায় এ সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী: (হে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যা ফাতেমা! আমি আল্লাহর

শাস্তি থেকে তোমাকে একটুও বাঁচাতে পারব না।) কোথায় আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের এ কথা, আর কোথায় সে তথাকথিত 'কাসীদা বুরদা' নামক গাঁথাতে আসা কবি বূসিরীর উক্তি:

ولن يضيق رسول الله جاهـــك بي ...... إذا الكريم تحلى باسم منتقم

فإن لي ذمة منه بتسمـــــــــــــيتي ...... محمدا وهو أوفى الخلق بالذمـــم

إن لم تكـن في معادي آخذا بيدي ....... فضلا وإلا فقل يا زلة القــدم

"হে রাসূলাল্লাহ! তোমার মর্যাদা আমার জন্য সংকোচিত হবে না, যখন আল্লাহ কারীম আমার ওপর প্রতিশোধ নিতে উদ্যত হবেন।

মুহাম্মাদ নামকরণে আমার প্রতি দায়িত্ব রয়েছে তার ওপর। আর তিনিই হলেন সর্বাধিক দায়িত্ব পূরণকারী।

দয়া করে যদি তিনি হাতে ধরে আমায় উদ্ধার না করেন তাহলে আমার পদস্খলন নিশ্চিত।”

নিজের মঙ্গল কামনাকারীর পক্ষে উপরোক্ত কবিতাগুচ্ছ ও তার অর্থ সম্পর্কে গভীর চিন্তা-ভাবনা করা উচিৎ। যে সকল সাধারণ মানুষ ও তথাকথিত আলেমবর্গ যারা এগুলোর প্রতি আকৃষ্ট এবং কুরআন মাজীদের পরিবর্তে এগুলোর যারা আবৃত্তি করে, তাদেরও এ ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করে দেখা উচিৎ। কোনো বান্দার অন্তরে কি এ কবিতাগুচ্ছের প্রতি বিশ্বাস আর আল্লাহ তা‘আলার বাণী:

﴿ يَوۡمَ لَا تَمۡلِكُ نَفۡسٌ لِّنَفۡسٍ شَيۡـٔٗاۖ وَٱلۡأَمۡرُ يَوۡمَئِذٖ لِّلَّهِ ١٩ ﴾ [الانفطار: ١٩]

“যেদিন কেউ কারো উপকার করতে পারবে না এবং সেদিন সব কর্তৃত্ব হবে আল্লাহর।” [সূরা আল-ইনফিতার, আয়াত: ১৯] এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস: “হে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর কন্যা ফাতেমা! আমি আল্লাহর শাস্তি থেকে তোমাকে একটুও বাঁচতে পারব না।” এর

প্রতি বিশ্বাস একত্রিত হতে পারে? আল্লাহর শপথ, তা হতে পারে না, আল্লাহর শপথ, তা হতে পারে না, আল্লাহর শপথ, তা হতে পারে না। যেমন একত্রিত হতে পারে না এ কথা বলা যে, -মূসা আলাইহিস সালাম সত্য, অনুরূপ ফির'উনও সত্য। তদ্রূপ একথা কথা বলা যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত আবার আবু জাহলও সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

**কবিতা:**

لا والله ما استويا ولن يتلاقيا ...حتى تشيب مفارق الغربان.

"আল্লাহর শপথ, বিষয় দু'টি সমান নয়। তা একত্রিত হতে পারে না, যতক্ষণ না কাকের মাথা শুভ্র বর্ণের হবে।"

সুতরাং যে ব্যক্তি এ বিষয়টি অনুধাবন করবে এবং বুরদার কবিতা ও এর আসক্ত ব্যক্তিদের প্রতি দৃষ্টি প্রদান করবে, সে ভালো করেই ইসলামের অসহায়তা উপলব্ধি করতে পারবে। এটিও উপলব্ধি করতে পারবে যে, শত্রুতা এবং আমাদের জানমাল ও নারীদের হালাল মনে

করা প্রকৃতপক্ষে আমাদের পক্ষ থেকে তাদের কাফির বলা বা তাদের সাথে যুদ্ধ করার কারণে নয়; বরং তারাই (বিরোধীরা) আমাদের ওপর যুদ্ধ ও কুফুরী ফাতওয়া শুরু করেছে। শুরু করেছে তখনই যখন আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত বাণী তুলে ধরা হলো। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَأَنَّ ٱلۡمَسَٰجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدۡعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدٗا ١٨﴾ [الجن: ١٨]

"সুতরাং তোমরা আল্লাহর সাথে কাউকে ডেকো না।" [সূরা আল-জিন্ন, আয়াত: ১৮]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

﴿ أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ يَدۡعُونَ يَبۡتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ ٱلۡوَسِيلَةَ أَيُّهُمۡ أَقۡرَبُ﴾ [الاسراء: ٥٧]

"তারা যাদের আহ্বান করে তারাই তো তাদের রবের নৈকট্য অনুসন্ধান করে যে, তাদের মধ্যে কে কত নিকটতম হতে পারে।" [সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ৫৭]

তিনি আরো বলেন:

﴿لَهُۥ دَعۡوَةُ ٱلۡحَقِّۚ وَٱلَّذِينَ يَدۡعُونَ مِن دُونِهِۦ لَا يَسۡتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيۡءٍ﴾ [الرعد: ١٤] "সত্যের আহ্বান তাঁরই, যারা তাঁকে ব্যতীত অপরকে আহ্বান করে তাদের কোনোই সাড়া দেয় না ওরা।" [সূরা আর-রা'দ, আয়াত: ১৪]

এ হলো মুফাসসিরগণের ঐকমত্যে আল্লাহর বাণী مَٰلِكِ يَوۡمِ ٱلدِّينِ এর মর্মার্থের কিয়দাংশ। আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং এ আয়াতের ব্যাখ্যা দিয়েছেন সূরা ইনফিতারের কয়েকটি আয়াতে, যা ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রিয় পাঠক! (আল্লাহ আপনাকে তার আনুগত্যের পথে পরিচালিত করুন) জেনে রাখুন, সর্বদা অসত্যের সাথে সংঘর্ষের মাধ্যমে সত্য স্পষ্ট হয়ে উঠে। আরবীতে বলা হয়: وبضدها تتبين الاشياء অর্থাৎ সকল বস্তু তার বিপরীত বস্তুর মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে উঠে।

প্রিয় পাঠক! উপরে যা বলা হলো সে বিষয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস এবং বছরের পর বছর চিন্তা-ভাবনা করে দেখুন, নিশ্চয় আপনি সঠিকভাবে জানতে পারবেন, আপনার প্রপিতা ইবরাহীম আলাইহিস

সালামের মিল্লাত ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দীন। ফলে, সে পথে চলে তাদের উভয়ের সাথে কিয়ামতের দিন একত্রিত হবেন এবং এ পৃথিবীতে সত্য পথ থেকে দূরে থাকার কারণে কর্মফল দিবসে হাওযে কাওসার থেকে বিদূরিত হবেন না, যেমন বিদূরিত হবে সেই ব্যক্তি যে তাদের পথে লোকদের বাধা প্রদান করেছিল। আশা করি, আপনি কিয়ামতের দিন পুলসিরাতের উপর দিয়ে নিরাপদে পার হবেন। আপনার পদস্খলন ঘটবে না, যেমন ঘটবে ঐ ব্যক্তির পৃথিবীতে তাদের (ইবরাহীম ও মুহাম্মাদ এর) সীরাতে মুস্তাকীম থেকে যার পদস্খলন ঘটে থাকবে। সুতরাং আপনার কর্তব্য সর্বদা ভয় ও উপস্থিত চিত্তে এ ফাতিহার দো‘আ পাঠ করা।

﴿إِيَّاكَ نَعۡبُدُ وَإِيَّاكَ نَسۡتَعِينُ ۝٥﴾ [الفاتحة: ٥]

“(হে আল্লাহ!) আমরা শুধু তোমারই ইবাদাত করি এবং তোমারই সাহায্য কামনা করি।” [সূরা আর-ফাতিহা, আয়াত: ৫]

ইবাদতের অর্থ পূর্ণ মহব্বত, চরম বিনয়, ভয় ও অবচয়ন। এখানে কর্মকে ক্রিয়ার পূর্বে (অর্থাৎ نعبدُ এর পূর্বে إياك শব্দকে নিয়ে আসা) এবং দ্বিতীয়বার (إياك শব্দকে পুনরায়) উল্লেখ করার উদ্দেশ্য ক্রিয়ার প্রতি অধিকতর গুরুত্ব প্রদান এবং ক্রিয়াকে কর্মের মধ্যে সীমিত রাখা। অর্থাৎ অন্য কারো নয় কেবল তোমারই ইবাদাত করি এবং কেবল তোমার ওপরই ভরসা করিإِيَّاكَ نَعۡبُدُ অর্থাৎ ইবাদাতে কেবল তোমারই তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করি।

এর অর্থ: আপনি আপনার রবের সাথে ওয়াদা ও চুক্তিবদ্ধ হচ্ছেন যে,  আপনি তাঁর সাথে তাঁর ইবাদাতে কাউকে শরীক করবেন না, হোক না সে ফিরিশতা বা নবী বা অন্য কেউ। যেমন, সাহাবীগণকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে:

﴿وَلَا يَأۡمُرَكُمۡ أَن تَتَّخِذُواْ ٱلۡمَلَـٰٓئِكَةَ وَٱلنَّبِيِّـۧنَ أَرۡبَابًاۗ أَيَأۡمُرُكُم بِٱلۡكُفۡرِ بَعۡدَ إِذۡ أَنتُم مُّسۡلِمُونَ ٨٠﴾ [ال عمران: ٨٠]

“এবং সে তোমাদের নির্দেশ দেয় না যে, তোমরা ফিরিশতা ও নবীগণকে নিজেদের রব হিসেবে গ্রহণ করে নাও। তোমরা মুসলিম হবার পর সে কি তোমাদের কুফুরী শিখাবে?” [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৮০]

আয়াতটি অনুধাবন করুন এবং স্মরণ করুন, পূর্বে রুবুবিয়্যাত সম্পর্কে আলোচনায় যা বলেছিলাম। তাজ ও শামসানের প্রতি আরোপিত কু-বিশ্বাস ও কুসংস্কার জাতীয় কাজ যদি সাহাবীগণ রাসূলগণের সাথে করলে মুসলিম হওয়ার পর কাফের হয়ে যেত, তাহলে যে লোক ঐরূপ কাজ তাজ বা তার অনুরূপ লোকের সাথে করে সে কী হতে পারে?

﴿وَإِيَّاكَ نَسۡتَعِينُ ۝٥﴾ [الفاتحة: ٥] “এবং আমরা শুধু তোমারই সাহায্য কামনা করি।” [সূরা আল-ফাতিহা, আয়াত: ৫]

وَإِيَّاكَ نَسۡتَعِينُ এর মধ্যে দু'টি বিষয় রয়েছে, প্রথম বিষয়- আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা আর তা হলো তওয়াক্কুল করা এবং স্বীয় শক্তি সামর্থ্যের অহমিকা থেকে বিমুক্ত হওয়া। আর দ্বিতীয় বিষয় হলো- বাস্তবে আল্লাহর নিকট

থেকে সাহায্য লাভের তলব পেশ করা। উপরে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ সাহায্য প্রার্থনা বান্দার ভাগে পড়ে।

﴿ٱهۡدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلۡمُسۡتَقِيمَ ۝٦﴾ [الفاتحة: ٦]

"(হে আল্লাহ!) আমাদের সরল-সহজ পথে চালাও।" [সূরা আল-ফাতিহা, আয়াত: ৬]

এটিই হলো, আল্লাহর নিকট বান্দার স্পষ্ট দো'আ, যা বান্দার ভাগে রয়েছে। এর অর্থ বিনয়, নম্র, অবিচল হয়ে আল্লাহর নিকট এ প্রার্থনা করা যে, তিনি যেন প্রার্থনাকারীকে এ মহান মতলব (সিরাতে মুস্তাকীম) দান করেন। এটি এমন মতলব, দুনিয়া ও আখেরাতে এর চেয়ে উত্তম কিছু আল্লাহ কাউকে দান করেন নি। আল্লাহ তা'আলা হুদায়বিয়ার সন্ধি নামক বিজয়ের পর তাঁর প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর অনুগ্রহের উল্লেখ করে বলেন:

﴿وَيَهۡدِيَكَ صِرَٰطٗا مُّسۡتَقِيمٗا﴾ [الفتح: ٢]

“(যাতে তোমার) রব তোমাকে সিরাতে মুস্তকীমের পথে পরিচালিত করেন।” [সূরা আল-ফাতহ, আয়াত: ২]

এখানে الهداية বলতে তাওফীক ও পথ প্রদর্শন বুঝনো হয়েছে।

বান্দার পক্ষে উচিৎ উপরোক্ত বিষয়ের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করা। কেননা সিরাতে মুস্তাকীমের প্রতি হিদায়াতের মধ্যে ফলপ্রসূ জ্ঞান ও নেক আমল অন্তর্ভুক্ত, যাতে বান্দা আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ (মৃত্যু) পর্যন্ত এর ওপর সঠিকভাবে পরিপূর্ণ পদ্ধতিতে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে।

الصراط এর অর্থ স্পষ্ট পথ। আর المسقيم এর অর্থ এমন পথ যার মধ্যে কোনো বক্রতা নেই। সিরাতে মুস্তাকীম দ্বারা সেই দীন বুঝানো হয়েছে যা আল্লাহ তা‘আলা তাঁর রাসূলের ওপর নাযিল করেছেন এবং এটিই তাদের পথ যাদের ওপর আল্লাহ নি‘আমত দান করেছেন। আর তারা

হলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর প্রিয় সাহাবীগণ।[7]

প্রিয় পাঠক! আপনি সর্বদা প্রতি রাকাতে এ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে দো‘আ করছেন, তিনি যেন আপনাকে নি‘আমতপ্রাপ্তদের পথে পরিচালত করেন।

---

7. ٱلَّذِينَ أَنۡعَمۡتَ عَلَيۡهِمۡ "তুমি যাদের ওপর নি‘আমত দান করেছ" - এর ব্যাখ্যায় এখানে তাফসীর ইবন কাসীরে বর্ণিত আব্দুর রহমান ইবন যায়দ ইবন আসলামের তাফসীর অনুসরণ করা হয়েছে। তবে ইবন কাসীরসহ অধিকাংশ মুফাসসির আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা-এর তাফসীরকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তারা আয়াতের ব্যাখ্যায় এ আয়াতে পেশ করেন:

﴿وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُوْلَـٰٓئِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنۡعَمَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ وَٱلصِّدِّيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّـٰلِحِينَۚ وَحَسُنَ أُوْلَـٰٓئِكَ رَفِيقٗا ٦٩﴾ [النساء: ٦٩]

"আর যে ব্যক্তি আল্লাহর হুকুম ও তাঁর রাসূলের হুকুম মান্য করবে সে ঐসব লোকের সাথী হবে যাদের প্রতি আল্লাহ পাক অনুগ্রহ করেছেন, তাঁরা হলেন, নবী, সিদ্দীক, শহীদ এবং সৎকর্মশীল নেক বান্দাগণ। আর তাদের সান্নিধ্য কতই উত্তম। [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৬৯] -অনুবাদক।

আপনার ওপর কর্তব্য হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার এ কথা সত্য বলে স্বীকার করা যে, এ পথই হলো সিরাতে মুস্তাকীম। তাই যখনই কোনো পদ্ধতি, জ্ঞান বা ইবাদাত এ পথের পরিপন্থী হবে তা সিরাতে মুস্তাকীম হতে পারে না, বরং তা হবে বক্র ও বিভ্রান্ত। এটিই উক্ত আয়াতের প্রথম দাবী এবং একে অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করতেই হবে। প্রত্যেক মুমিনকে অবশ্যই শয়তানের এ প্রবঞ্চনা ও ধোকা থেকে বাঁচতে হবে, আর তা হচ্ছে এটা মনে করা যে, উপরোক্ত বিষয়ে মোটামুটিভাবে বিশ্বাস রেখে বিস্তারিত জানা পরিত্যাগ করা চলে, এ বিশ্বাস থেকে সতর্ক থাকতে হবে। কেননা সবচেয়ে বড় কাফের মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) ব্যক্তিরাও এ বিশ্বাস পোষণ করে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং যা তাঁর বিরোধী হবে তা বাতিল। এরপর তাদের সামনে এমন কিছু আসে যা তাদের প্রবৃত্তি চায় না, তখন তারা ওদের মতো হয়ে যায়, যাদের প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿فَرِيقًا كَذَّبُواْ وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ﴾ [المائدة: ٧٠]

“তখন তারা এক দলকে অবিশ্বাস করে এবং এক দলকে তারা হত্যা করে।” [সূরা আল-মায়েদা, আয়াত: ৭০]

আল্লাহর বাণী:

﴿غَيۡرِ ٱلۡمَغۡضُوبِ عَلَيۡهِمۡ وَلَا ٱلضَّآلِّينَ﴾ [الفاتحة: ٧] “তাদের পথে নয় যাদের ওপর তোমার গযব পড়েছে এবং তাদেরও নয় যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে।” [সূরা আল-ফাতিহা, আয়াত: ৭]

ٱلۡمَغۡضُوبِ عَلَيۡهِمۡ যাদের উপর গযব পড়েছে তারা হল ঐসব আলেম যারা তাদের ইলম মোতাবেক আমল করে নি এবং الضالون ‘পথভ্রষ্ট’ ওরাই যারা ইলম ব্যতিরেকে আমল করে। প্রথমটি হলো ইয়াহূদীদের বৈশিষ্ট্য আর দ্বিতীয়টি হলো খৃষ্টানদের বৈশিষ্ট্য।

অনেক লোকের অবস্থা হলো, তারা যখন তাফসীরে দেখে ইয়াহূদীরা গযবপ্রাপ্ত আর খৃষ্টানরা পথভ্রষ্ট, তখন সেই জাহেল লোকদের ধারণা হয় যে, উপরোক্ত গুণাবলী ইয়াহূদী ও খৃষ্টানদের বেলায়ই প্রযোজ্য এবং এ কথাও

তারা স্বীকার করে যে, আল্লাহ তা‘আলা তাদের ওপর ফরয করে দিয়েছেন যেন তারা এ দো‘আ করে এবং উপরোক্ত গুণ বিশিষ্ট লোকদের পথ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে।

সুবহানাল্লাহ! কীভাবে সে ধরণা করে যে, তাকে আল্লাহ তা‘আলা এ শিক্ষা দিলেন এবং তার জন্য পছন্দ করে তার ওপর ফরয করে দিলেন যেন সে সর্বদা এ দো‘আ করে অথচ তার ওপর এ কাজের কোনো ভয় নেই। এমনকি সে চিন্তাও করে না যে, সে এমন কাজ করতে পারে। এটি আল্লাহর ওপর তার কু-ধারণার অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহই সর্বাধিক জানেন। (সূরা ফাতিহা-এর ব্যাখ্যা এখানেই শেষ)

উল্লেখ্য যে, আমীন শব্দটি সূরা আল-ফাতিহা-এর অংশ নয়। এটি দো‘আর ওপর সমর্থন সূচক শব্দ। এর অর্থ: ‘হে আল্লাহ! তুমি কবুল কর।’ জাহেল লোকদের এ বিষয়টি জানিয়ে দেওয়া কর্তব্য, যাতে তারা এ ধারণা

পোষণ না করে যে, এ শব্দটি আল্লাহর কালামের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

পরিশেষে, দুরূদ ও সালাম জানাই আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাঁর পরিবারবর্গ ও সাহাবীগণের প্রতি।

সমাপ্ত

এখানে এমন কিছু বিষয় উল্লেখ করা হচ্ছে যা শাইখুল ইসলাম মুহাম্মাদ ইবন আবদুল ওহহাব রহ. সূরা ফাতিহা থেকে চয়ন করেছেন:

১- إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ এতে আল্লাহর তাওহীদ সাব্যস্ত হয়েছে।

২- اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ এতে রাসূলের আনুগত্যের বিষয়টি সাব্যস্ত হয়েছে।

৩- দীনের তিনটি রুকন রয়েছে। ভালোবাসা, আশা ও ভয়। প্রথম আয়াতে রয়েছে ভালোবাসা, দ্বিতীয়টিতে রয়েছে আশা, আর তৃতীয়টিতে রয়েছে ভয়।

৪- অধিকাংশ মানুষ প্রথম আয়াতের অর্থ জানা না থাকার কারণে ধ্বংস হয়েছে। অর্থাৎ যাবতীয় হামদ (প্রশংসা) ও যাবতীয় রুবুবিয়াত বা প্রভুত্ব কেবল জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত না করার কারণেই ধ্বংস হয়েছে।

৫- প্রথম যারা নি'আমতপ্রাপ্ত তাদের সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন, প্রথম যারা রোষাণলে পড়েছে ও পথভ্রষ্ট হয়েছে তাদের সম্পর্কে জানা।

৬- নি'আমতপ্রাপ্তদের উল্লেখ করার মাধ্যমে আল্লাহ কর্তৃক তাদের সম্মানিত করা ও প্রশংসা করা হয়েছে।

৭- রোষাণলপ্রাপ্ত ও পথভ্রষ্টদের উল্লেখ কারার মাধ্যমে মহান আল্লাহর অপার ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির বিষয়টি প্রকাশ লাভ করল।

৮- সূরা ফাতেহা হচ্ছে দো‘আ, তবে এর সাথে সাথে স্মরণ রাখতে হবে যে আল্লাহ তা‘আলা অমনোযোগী অন্তর থেকে দো‘আ কবুল করেন না।

৯- صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ এ আয়াতাংশের মাধ্যমে ইজমা‘ তথা উম্মতের ঐকমত্য যে প্রমাণ তা সাব্যস্ত হলো।

১০- উক্ত বাক্য থেকে বুঝা যায় যে, মানুষকে যদি তার নিজের ওপর ন্যস্ত করা হয় তবে সে ধ্বংস হয়ে যাবে।

১১- এ আয়াতসমূহে তাওয়াক্কুল তথা আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুলের বিষয়টি ফুটে উঠেছে।

১২- এ আয়াতসমূহের মাধ্যমে প্রমাণিত হলো যে শির্ক অসার বিষয়।

১৩- এ আয়াতসমূহের মাধ্যমে বিদ‘আতের অসারতা প্রমাণিত হলো।

১৪- সূরা আল-ফাতিহার কোনো একটি আয়াত যদি কেউ ভালোভাবে জানে তবে সে ফক্বীহ হিসেবে বিবেচিত হবে। আর এর প্রতিটি আয়াত নিয়ে আলাদা আলাদা গ্রন্থ রচিত হতে পারে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা‘আলা সবচেয়ে বেশি জানেন।

সূরা আল-ফাতিহা মূলতঃ একটি প্রার্থনা বিশেষ, যা আল্লাহ তা'আলা মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন। অবশিষ্ট কুরআন হলো তাঁর পক্ষ থেকে এর জবাব, যার মধ্যে মানবকুলের জন্য সহজ-সরল ও সঠিক জীবন-পথের পুর্ণাঙ্গ ও বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। শাইখুল ইসলাম মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল ওয়াহহাব রহ. কর্তৃক রচিত সূরা আল-ফাতিহা-এর এ তাফসীরখানা অতি সংক্ষিপ্ত হলেও তিনি এর মধ্যে আল্লাহর সাথে বান্দার মোনাজাত ও ইবাদাতে তাওহীদ -এ দু'টি বিষয় অত্যন্ত চমৎকার ও যুক্তিপূর্ণভাবে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন।